103

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

আমাদের শিক্ষার দৈন্যদশা ও বিদেশে লেখাপড়া

আ.ন.ম. নূরুল হক

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আমার পুত্রটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তার স্কুলে প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় 'হযবরল' বাগ্‌ধারাটি দিয়ে বাক্য রচনা করতে গিয়ে লিখেছে- 'আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এক হযবরল অবস্থা'। পরীক্ষক তাকে এই বাক্যটির জন্য কোন নম্বর দিবেন কি দিবেন না তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার মাথা ব্যথা হচ্ছে, বাংলাদেশের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা বোঝাতে একটা যুৎসই বাংলা শব্দ বের করা নিয়ে। কোন কিছুর বিশৃঙ্খল অবস্থা বোঝাতে আমরা এই 'হযবরল' বাগধারাটি ব্যবহার করে থাকি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি, অনিয়ম, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সন্ত্রাস, নকলবাজি, জালিয়াতি, সেশন জট ইত্যাদি হাজারো বিশৃঙ্খলার অভূতপূর্ব এক মহাসম্মিলন। এক শব্দে কেন, লাখ শব্দেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া ছাড়া আর সবকিছুই চলে অবাধে। 'সব কিছু'র এই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত আছে ছাত্র-শিক্ষকের রাজনীতি, সন্ত্রাস, মারপিট, বোমাবাজি, খুনাখুনি, হলদখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যখন ছাত্রীর শ্লীলতাহানির বা টাকার বিনিময়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেবার মতো গর্হিত কাজের অভিযোগ শোনা যায়, তখন লজ্জায় কানে আঙুল গোঁজা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না।

আর পরীক্ষা, সেতো নকলের এক মহোৎসব। তা এস,এস,সি, এইচ,এস,সি, ডিগ্রী, দাখিল আলিম, ফাজিল যে কোন পরীক্ষাই হোক না কেন। নকলের এই মহোৎসবে আজ আর শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, তাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, জনদরদী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী সবাই সাধ্যমত শরীক হন। পরীক্ষা কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাদের হাতে, উপযুক্ত পারিতোষিকের বিনিময়ে তারাও নকল করার কাজে পরীক্ষার্থীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। মাঝখান থেকে মুষ্টিমেয় কিছু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অসহায় অভিভাবকগণ বোবা কান্নায় বুক ভাসান। নকলের এই মহোৎসব নিয়ে সাম্প্রতিককালে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এতো বেশি প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় এবং মতামত ছাপা হয়েছে যে, সবগুলো একত্রিত করলে তা এক বিশাল গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। এতো লেখালেখির পরও যদি কিছু না হয় তাহলে আর কোন দিনও হবে না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বলেই দেশের সর্বস্তরের জনগণের অভিযোগ। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই এক অবস্থা। শিক্ষকগণ খেয়াল-খুশি মত আসেন, ক্লাস না নিয়ে খেয়াল-খুশি মতোই আবার চলে যান। পড়তে হলে এসো বাসায় নয়তো কোচিং সেন্টারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের এসব ছোটখাট বিষয় দেখার মতো সময় নেই। তাঁরা ব্যস্ত থাকেন শিক্ষকগণের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি আর স্কলারশিপ দিয়ে বিদেশে পাঠানো নিয়ে। আর শিক্ষা বোর্ডগুলোতো দুর্নীতির আখড়া। উপযুক্ত পারিতোষিক পেলে তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। ফেল করা ছাত্রকেও বসিয়ে দিতে পারেন মেধা তালিকার শীর্ষে। এমনি একটি নজির স্থাপন করে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড দুর্নীতির সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। অনুসন্ধান করলে এরকম আরো দু'-একটি কালো বেড়াল অন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর থলে থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

সারা দেশে নাকি দু'হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। কাজীর গরুর মতো শুধু সরকারী অর্থ বরাদ্দের হিসেবে আছে। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী দেশে বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ আট হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভুয়া শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। এসব ভুয়া শিক্ষকদের প্রকৃত শিক্ষক হিসেবে দেখিয়ে প্রতি বছর প্রায় একশ কোটি টাকা সরকারী কোষাগার থেকে অবলীলাক্রমে লোপাট করা হচ্ছে। এই লোপাট চলছে বছরের পর বছর ধরে। অথচ এ ধরনের অকর্মে জড়িত ব্যক্তিদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। ফলে অপকর্মের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে জ্যামিতিক হারে। কিছুদিন আগে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনকালে মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক অধঃপতন চরমে পৌঁছেছে। হিতোপদেশে কাজ হবে না। প্রয়োজন কঠোর শাস্তি।

দুর্নীতি, অশিক্ষা আর কুশিক্ষার অব্যাহত দংশনে আমাদের শিক্ষার বারোটা অনেক আগেই বেজে গেছে। দিনে দিনে নীচে নেমে যাচ্ছে শিক্ষার মান। আমাদের দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার গ্রহণযোগ্যতা নেই পৃথিবীর কোন স্থানে। একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য এর চেয়ে বড় লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে? আর্থিক সচ্ছলতা আর সুযোগ যাদের আছে তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরকে দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করানোর ব্যাপারে আজ আর মোটেও উৎসাহ বোধ করেন না। আগে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে কৃতী ছাত্রছাত্রীগণ সরকারী বৃত্তি নিয়ে শুধু উচ্চশিক্ষার জন্যই বিদেশে যেতো। এখন যাচ্ছে ঢালাওভাবে। এদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীই আছে। দেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পছন্দমতো বিষয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছে এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও কম নয়। তবে সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীই বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে এবং সেশন জটের আতংকে। অসংখ্য দুর্নীতির বোঝা মাথায় বয়ে এমনিতেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা নুয়ে পড়েছে সজনে গাছের মতো, তার উপর শিক্ষার ঘাড়ে চেপে বসেছে সেশন জট নামক সিন্দাবাদের সেই বুড়ো দৈত্যটা, যার নামার কোন লক্ষণ নেই। তিন বছর অনার্স কোর্স তাই ছয় বছরেও শেষ হয় না। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই সেশন জটের এক বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদের ১৯৯২ সালের এম,এস,সি পরীক্ষা ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত হবে। দুই বছরের এই মাস্টার্স কোর্স শেষ হতে লেগেছে নয় বছর। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে লাগবে অন্তত আরো এক বছর। সর্বমোট দশ বছর। এই ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের সরকারী চাকুরীর বয়স নিশ্চয়ই অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এই একই অবস্থা বলতে গেলে দেশের প্রায় সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েই বিরাজ করছে। কাজেই সুযোগ আর সামর্থ্য দু'টোই যাদের আছে তারা যে লেখাপড়ার জন্য বিদেশে চলে যাবে, এতে অবাক হবার মতো কিছুই নেই।

তবু কিছু কথা থেকে যায়। বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে গিয়ে লেখাপড়ার জন্য প্রতি বছর কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেল একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে। প্রতিবছর গড়ে আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশ থেকে অনাপত্তির সার্টিফিকেট নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লেখাপড়ার জন্যে যাচ্ছে। এজন্য তারা বছরে প্রায় দেড় কোটি মার্কিন ডলার বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। বৈধ ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে যারা পড়তে যাচ্ছে, এই হিসাবটি শুধু মাত্র তাদের বাৎসরিক খরচের হিসাব। অবৈধভাবে যারা বিদেশে পড়তে যাচ্ছে তাদের সংখ্যা নাকি বৈধদের বহুগুণ। স্বাভাবিকভাবে তাদের খরচের অংকটাও হবে দেড় কোটি ডলারের বহুগুণ। হুন্ডির মাধ্যমে এই বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানো হচ্ছে বলে এর হিসাব সরকারের খাতাপত্রে নেই। একটা গরীব দেশের কষ্টার্জিত এই বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কি অপচয়ের সামিল নয়?

ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় ৩০টি দেশে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার জন্য পাড়ি জমাচ্ছে। এসব দেশের মধ্যে এমন দেশও রয়েছে যার অবস্থান বিশ্ব-মানচিত্রে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কলিম্পং, গ্যাংটকসহ ভারতের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বাংলাদেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে। এদের শতকরা নব্বই জনই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রী এবং কোনরূপ বৈধ অনুমতি ছাড়াই সেখানে লেখাপড়া করছে। এসব ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়ার খরচের বৈদেশিক মুদ্রা যোগান দেবার জন্য সারা দেশে হুন্ডি ব্যবসা জমজমাট রূপ ধারণ করেছে।

এতো গেল সমস্যার একটি দিক-অর্থনৈতিক দিক। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী অপর দিকটা রীতিমত ভয়াবহ। বিদেশে লেখাপড়া, ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন আজকাল দেদার ছাপা হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। বিনা বেতনে বিদেশে লেখাপড়ার লোভনীয় সুযোগের কথাও থাকে অনেক বিজ্ঞাপনে। অর্থের বিনিময়ে বিদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার শত-শত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সারা দেশে। এসব এজেন্টদের মাধ্যমে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা যেসব বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে, সেগুলো মূলত ব্যবসায়িক লক্ষ্যে পরিচালিত। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুধুমাত্র আজ্ঞাবহ কর্মচারী তৈরির লক্ষ্যে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমরা নিন্দে করে এসেছি শতমুখে। সোয়াদু'শ বছরের উপনিবেশী জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি আর ব্যর্থতা কাটিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতি গঠনমূলক তৎপরতায় যাতে যথাযথ অবদান রাখতে পারে, সেজন্য দেশে প্রণীত হয়েছে বাস্তব ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি। কিন্তু বিদেশের মাটিতে আমাদের দেশের কোমলমতি শিশু-কিশোরেরা যে ধরনের শিক্ষা লাভ করছে তাতে তারা কি একদিন এদেশের মাটি ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না? বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের বীরোচিত ইতিহাস, এর সুদীর্ঘ পটভূমি এসব ওরা জানবে কোত্থেকে? বাংলাদেশের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মগজের কোষে কোষে পুঁতে দেয়া বিদেশী সংস্কৃতির বীজ থেকে একদিন চারা গজাবে, গাছটি বড় হয়ে তাতে ফুল, ফল ধরবে। কিন্তু সেই ফল যেনো এদেশের মানুষের জন্যে বিষফল না হয়।

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শুধুমাত্র আজ্ঞাবহ কর্মচারী তৈরির লক্ষ্যে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমরা নিন্দে করে এসেছি শতমুখে। সোয়াদু'শ বছরের উপনিবেশী জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি আর ব্যর্থতা কাটিয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোরের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতি গঠনমূলক তৎপরতায় যাতে যথাযথ অবদান রাখতে পারে, সেজন্য দেশে প্রণীত হয়েছে বাস্তব ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি। কিন্তু বিদেশের মাটিতে আমাদের দেশের কোমলমতি শিশু-কিশোরেরা যে ধরনের শিক্ষা লাভ করছে তাতে তারা কি একদিন এদেশের মাটি ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে না? বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের বীরোচিত ইতিহাস, এর সুদীর্ঘ পটভূমি এসব ওরা জানবে কোত্থেকে? বাংলাদেশের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের মগজের কোষে কোষে পুঁতে দেয়া বিদেশী সংস্কৃতির বীজ থেকে একদিন চারা গজাবে, গাছটি বড় হয়ে তাতে ফুল, ফল ধরবে। কিন্তু সেই ফল যেনো এদেশের মানুষের জন্যে বিষফল না হয়।

ক্যাডেট কলেজে ছেলেকে পড়িয়ে আমার এক অতি পরিচিত ব্যক্তি প্রায়ই খুব আক্ষেপ করে বলতেন, যে বয়সে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে সময়টাতেই ছেলেটাকে লেখাপড়ার নামে দূরে সরিয়ে রেখেছি। ফলে ছেলের সঙ্গে আমার মনের একটা অদৃশ্য দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই দূরত্ব অতিক্রম করে আগের মতো আমরা আর কেউ কাউকে কাছে টানতে পারছি না। বাংলাদেশের যে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর আজ নানা দেশে লেখাপড়া শিখছে মাটির টানে তারা যদি কোনদিন ফিরে আসে এই হতদরিদ্র জন্মভূমিতে তাহলে তারা কি পারবে মনের গভীরে সৃষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে তাদের জন্মভূমিকে। আজ এটাও ভাববার সময় এসেছে।

সন্ত্রাস আর বিদ্যুৎ নিঃসন্দেহে দু'টি মারাত্মক জাতীয় সমস্যা। কিন্তু শিক্ষা সমস্যার ভয়াবহতা এদু'টি সমস্যা থেকে কোন অংশেই কম নয়। শিক্ষা সমস্যার প্রতিক্রিয়া আমরা তাৎক্ষণিক উপলব্ধি করছি না বলেই এটি এখনও সবার মগজে ঢুকেনি। তবে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁরা আতংকগ্রস্ত না হয়ে পারেন না। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এজন্য প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। দরিদ্র কৃষক থেকে শুরু করে আমরা দেশের সবাই কম-বেশি এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কর দিয়ে আসছি। জনগণের অর্থে পরিচালিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার হাল এমন হবে কেন? দলমত নির্বিশেষে আমরা এদেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক যদি সচেষ্ট হই তাহলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। নইলে, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এজন্য আমাদের সবাইকে দিতে হবে চরম মূল্য। ❑